কপিরাইট মুক্তি এবং রবীন্দ্র রচনাসম্পদের ভাগ্যপরীক্ষাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. আবীর চট্টোপাধ্যায়

(এই বিষয়ে বক্তৃতাটি গত ১৬ মে, ২০২০ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত ওয়েবিনার এ প্রদত্ত হয়েছিল)

কপিরাইট কী এবং রবীন্দ্ররচনা সম্পদের কপিরাইটের চেহারাটি ঠিক কেমন?

প্রথমেই বলি, আমাদের অর্থাৎ সাধারণ পাঠক, শ্রোতার বহু বা অতি ব্যবহারে রবীন্দ্র সম্পদের তেমন কোনো গুণগত পরিবর্তন না হলেও, তাকে ঘিরে ব্যবহারিক ও সামাজিক পরিবর্তন অব্যশ্যই হবে। কপিরাইট থাকলেও হয়েছে, উঠে গেলেও হবে। আজ দু'দশকের অভিজ্ঞতায় অন্তত এই পরিবর্তন হয়েছে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

একথা বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রসৃষ্টির উপর থেকে কপিরাইট, অর্থাৎ বিশ্বভারতীর একচ্ছত্র অধিকারের সীমা শেষ হয়েছে আজ দু'দশক হল। আমরা মোটামুটি সবাই অবগত আছি যে, বার্ন কনভেনশন'এর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী কোনো দেশ কোনো লেখকের রচনাক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে কপিরাইটের অধিকার পেতে পারে মুখ্যত মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত। কোনো দেশে অবশ্য এই সীমা একশো বছর পর্যন্ত রয়েছে। যাই হোক, ভারতে এই কপিরাইট বিষয়টি পঞ্চাশ বছরেই সীমাবদ্ধ ছিল। একথা আমরা সবাই জানি যে রবিপ্রয়াণের পঞ্চাশ বছর পুর্তি হবার সময় ভারত সরকার কপিরাইট সংক্রান্ত আইন বিশেষ অধিকারবলে সংশোধন করে শুধুমাত্র রবীন্দ্ররচনার ক্ষেত্রে আরও দশ বছর বাড়িয়ে কপিরাইট সুরক্ষিত করে রাখলেন।

Society Language and Culture

বিষয়টি তাহলে কেমন দাঁড়াল -

(১) প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রশ্নে-

(ক) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তথা কর্তৃপক্ষ সমস্ত রবীন্দ্ররচনাসম্পদের পুনর্মুদ্রণ থেকে ব্যবসা পর্যন্ত একচ্ছত্র অধিপতি রইল।

(খ) এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র রবীন্দ্র রচনাবলী একবার প্রকাশ করার অনুমতি আদায় করেছিল।

যদিও সরকার ও বিশ্বভারতী দুই পক্ষই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিল যাতে রবীন্দ্রসম্পদের কপিরাইট বাড়ানো হয়।

এখন কপিরাইট ভোগ করা বলতে আমরা কী বুঝি? এর অর্থ হল,

(ক) যত রচনাসম্পদ রয়েছে যতবার সম্ভব তার পুনর্মুদ্রণ করে ব্যবসা করা। প্রমাণসাপেক্ষে এ ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর ব্যবসার পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকারও বেশি।

(খ) রবীন্দ্রগানের ক্ষেত্রে সমকালীন শিল্পীদের পরিবেশনের অনুমতি প্রদান এবং সিনেমা তথা অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রগানের ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের মুখ্য অধিকারী হলো বিশ্বভারতী। এক্ষেত্রে মিউজিক বোর্ড'কে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার দেওয়া হল। এর সামাজিক প্রভাব হল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কৌলিন্য বা জাতে ওঠার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা একেবারে রাজতন্ত্রের চেহারা নিয়েছিল।

(গ) এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হল বিশ্বভারতী। আর্থিক তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যের বিচারে সেসবের মূল্য অপরিসীম, একথা বলাই বাহুল্য।

ফলে, এই কপিরাইট সাম্রাজ্যের প্রভাব বলতে আখেরে কী দাঁড়াল? প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এক সামগ্রিক বাইনারি অবস্থান যা প্রতিষ্ঠান এবং তার বাইরের জগতকে আড়াআড়ি ভাগ করে দিল। সাধারণ জনগণের অবস্থান কী দাঁড়ালো? কেউ এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেনতেন লেগে, জড়িয়ে থাকতে চাইল যা বৃহত্তর সমাজে লিডারশিপ করার ক্ষেত্রে একরকমের সংশাপত্রের মতো বা কোয়ালিফিকেশনের মতো প্রতীয়মান হল, এমনকি আজও অনেকাংশে হয়ে চলেছে।

যাই হোক, কপিরাইট সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে বুদ্ধিজীবীমহল এতৎসত্ত্বেও যে মত দিলেন তা হলঃ

তাঁরা মনে করলেন, কপিরাইট তুললে অরাজকতা ঘটবে রবীন্দ্ররচনা নিয়ে;

আর যাঁরা মনে করলেন কপিরাইট না থাকলেও চলে, তাঁদের অবস্থানটি অনেকটা সমাজবিদ্যার ঐ স্বনিয়ন্ত্রিত বা স্বপরিবর্তনীয় এবং সেটাই স্বাভাবিক বলে তাঁরা মনে করলেন। এঁরা মনে করলেন, স্বাভাবিক নিয়মেই সব ঠিক হয়ে যাবে, অর্থাৎ সমাজ-সময় নিজেই নিজেকে সামলে নেবে।

Society Language and Culture

প্রাতিষ্ঠানিকতার সীমানার বাইরে

এই সীমানা থেকেই কীরকম যেন সব আলোচনাগুলো শেষ হয়ে যায়। যেন আর কিছু আলোচনার নেই। আসলে বিষয়টা এখান থেকেই বিতর্কিত হতে শুরু করে। কিন্তু কখনো তো আলোচনা করতেই হবে, কারণ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের গড়ে তোলা এক স্বর্গ বা অনেক স্বর্গের চেহারাটা বা চেহারাগুলি তো একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার। আর ঠিক সে কারণেই এর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ, এই সীমানার অপর পারে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ একে সামলাতেই পারবে না, এটা এককথায় স্বতসিদ্ধ ছিল।

তবে প্রথমেই যে অভিজ্ঞতার কথা বলা ভালো, সেটা হল, কপিরাইট ঘিরে নিয়ম এবং বেনিয়ম প্রায় একই সময় শুরু হয়েছিল। যাই হোক, আগে রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট বিষয়টির আসল চেহারাটি কেমন ছিল? অর্থাৎ, বাস্তবে এর সামাজিক অবয়বটি কেমন?

মুদ্রণ প্রকাশনা ক্ষেত্রে

কপিরাইট মুক্তির সময়ে প্রকাশকদের মধ্যেই বিতর্ক সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে প্রকাশনার 'মান' ছিল সামাজিক বিতর্কের প্রধান বিষয়। এখানে সাধারণ জনগণের বা জনজীবনের তেমন কোনো অংশগ্রহণই ছিল না বা থাকারও

কথা নয়। এটা নেহাতই ব্যবসা বা বাজারদখল সংক্রান্ত, যেখানে কপিরাইট উঠুক বা না উঠুক জনগণ কোনো না কোনোভাবে রবীন্দ্ররচনা পড়ার স্বাদ পাবেই। এক্ষেত্রে যেকথা আগেই বলা হয়েছে যে, ছাপার মান এবং মুদ্রণ-প্রমাদের যে সম্ভাবনা আছে বা ছিল তার জন্য বুদ্ধিজীবীর যে ভয় তার চেয়ে ব্যবসার পরিমাণ বহুগুণ ছিল, অথবা হয়তো এই দুই-এর কোনো তুলনাই চলে না। প্রমাণসাপেক্ষ মত হল, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের ব্যবসা তথা আয়ের পরিমাণই হল কয়েক হাজার কোটি টাকা। শুধুমাত্র কপিরাইটের কারণে তা একহাতে সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই এখানে যাদের উৎসাহ থাকার কথা তাদেরই ছিল, সাধারণ মানুষের খুব মাথাব্যথার কারণ ছিল বলে মনে হয় না।

আবার কপিরাইট ওঠার পরেও 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজী অনুবাদ 'সং অফারিংস' এবং 'ন্যাশনালিজম' বইদুটি তাদের শতবর্ষে দাঁড়িয়েও আর কেন প্রকাশিত হয় না, তার কোনো সদুত্তর আমাদের জানা নেই। অথচ 'ন্যাশনালিজম' বইটি ম্যাকমিলান থেকে প্রথম প্রকাশিত হবার পর একলপ্তে পাঁচ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল।

আঁকা ছবির ক্ষেত্রে

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল থেকেই যার কাছে যত বেশি ছবি সঞ্চিত ছিল তিনিই সেই অধিকার লাভ করেছেন। কপিরাইট-এর কারণে তাঁরা সেই ছবি প্রকাশ্যে আনতে পারেননি। ফলে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে সেগুলি ট্রাঙ্কে সঞ্চিত হয়ে এককথায় নষ্টই হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন তথা সান্নিধ্যভোগ করা মানুষ তথা প্রতিষ্ঠানের কাছেই সেগুলো সঞ্চিত রয়ে গেছে। সাধারণ জনগণ এর পূর্ণ স্বাদ পাওয়া দূরে থাক, এর সম্পর্কে পূর্ণ তথ্যই পায়নি কখনো।

Society Language and Culture

গান ক্ষেত্রে

গানই হল রবীন্দ্র সম্পদের কপিরাইট-এর প্রশ্নে সবচেয়ে বিতর্কিত সেই বিষয়। সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নে এর কারণটি খুব সহজ, অর্থাৎ গান হল সামাজিক সক্রিয়তার সেই সর্বোৎকৃষ্ট আঙ্গিক যা মানুষ সহজে এবং ভালোবেসে ব্যবহার করে নিজেকে প্রকাশ এবং প্রমাণ করার জন্য। এক্ষেত্রে জীবনের আপন পরিসর থেকে বাজার পরিসর – সবই ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের কাছে সহজতর ছিল। তাই সব রচনার মধ্যে তাঁর গানই মানুষ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে। কেন? কবি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন - 'আপনাকে শতবর্ষ পরে মানুষ মনে রাখবে?' তিনি বলেছিলেন, 'না – কারণ আমি গান লিখিনি বা তৈরি করিনি'।

পক্ষান্তরে, এই সমগ্র বিষয়কে যদি সাধারণ মননচর্চার নিরিখে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে এখানেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর তেমন কোনো বিশেষ চেহারা ফুটে ওঠে না। গোটা জনমানস গত ষাট-সত্তর-আশির দশকে একক মিডিয়ার রাজত্বে এমন শ্রোতা ছিল যেখানে ব্রাত্য দেবব্রত বিশ্বাস। অন্যদিকে, কুলীনপ্রথার গ্রহণ ছিল একইমাত্রায়, যার ফলে কতিপয় ব্যক্তিবিশেষ বা র‍্যাডিক্যাল মূল্যে বিশ্বাসী মানুষ ছাড়া এমন দ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা হয়নি। আবার বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্বে বাজারের আতিশয্যে কৌলিন্যপ্রথা থেকে বিদ্রোহ – সবই বাজারের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল, একথা বলাই বাহুল্য। সে আলোচনা হবে।

যাই হোক, এ তো গেল কপিরাইট প্রশ্নে বা জমানায় সামাজিক অবয়ব কেমন ছিল। এখন এ প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন হল, এটাই কি আমাদের যাবতীয় আলোচনার শেষ বা প্রান্তিক স্টেশন? এর পরে কি আর আলোচনা করা যাবে না? অর্থাৎ, কপিরাইট থাকাকালীন এবং কপিরাইট মুক্তির পরে কী হল, তা নিয়ে কি আলোচনা করা যাবে না?

দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হলেও তেমন কোনো গঠনমূলক রেফারেন্স বা ইতিহাসনির্ভর টেক্সট কিন্তু তেমন তৈরি হয়নি, যা প্রশ্ন করতে পারে কপিরাইট থাকতে বা চলে যাবার পর কী কী ঘটনা ঘটল এবং কেন তা ঘটল? বা যা ঘটল তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সেগুলো তো নির্জলা ঘটনা হিসেবে থেকে যেতে পারে না। অতএব, একটা অবয়ববাদী আলোচনা হতেই হবে, নিঃশর্তে মেনে নেওয়ার জন্য নয়, বরং বিতর্ক করার জন্য।

কপিরাইট এবং এর সামাজিক প্রভাব

তবে এটা বোধহয় আমরা সবাই মানব যে, পপুলার সামাজিক প্রভাব বা বলা ভালো কুপ্রভাব থেকে বিষয়কে মুক্ত রাখার জন্য কোনো বিষয়ের কপিরাইট দরকার। আবার একথাও অনস্বীকার্য, সেই কপিরাইটই সমাজে আর এক পপুলার/ধ্রুপদী প্রভাবের অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি করে। যে মিশ্রণে একটা চিরকালীন দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। আর তা যায় বলেই দ্বন্দ্বকে অনেক ক্ষেত্রেই ভায়োলেশন বা বিচ্যুতি বলে মামলা করে সামাল দিতে হয়।

তো কপিরাইট দিয়ে বিষয়কে বাঁচানো তো হল, কিন্তু কপিরাইটের অধিকারী সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করে তার ধ্রুপদী উপাদানগুলি কী? অর্থাৎ, কপিরাইট কী কী উপাদান আগলে রেখে বিষয়কে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেয়?

Society Language and Culture

অবয়ববাদী তত্ত্বে মেটা-ডেটা বা মেটা-ন্যারেটিভ'এর মতো এগুলোকে আমরা মেটা-ইস্যু বলতে পারি, যা আসলে বিভিন্ন সমাজপটে নানা ঘটমান ইস্যুগুলিকে আগে থেকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলিকে আমরা মেটা-কোড বলতে পারি। সেগুলো কী কী?

মেটা ইস্যু বা মেটা কোডঃ

বাংলায় বললে দাঁড়ায় - কৌলিন্য, শুদ্ধতা, সঠিক পরিবেশনা, গায়কী, পবিত্রতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যাকরণ, এসবেরও পরে এক রবীন্দ্র সংস্কৃতি, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে, এগুলি সবই 'কপিরাইট' থাকার মূল কারণ হিসেবেই বিচার্য হয়েছে। অর্থাৎ, কপিরাইট জমানার উৎপাদিত 'সাইন' বা 'সংকেত' হিসেবে। এখন প্রশ্নটা কপিরাইট থাকলে 'ভালো' ঘটবে আর না থাকলে 'খারাপ'-ই হবে, বিষয়টা এমনও নয়। ট্রাফিক লাইট আছে বলেই তো সেই নিয়ম ভাঙা হয়। যেখানে সেটাই নেই, সেখানে নিয়ম ভাঙারও প্রশ্ন নেই। ফলে এগুলো একইসাথে ঘটে। কাজেই কপিরাইট উঠে যাবার পরেও এই সব মেটা কোড বা এক-একটি সংকেত বাজারের পাশাপাশি কৌলিন্যের প্রতীক হিসেবে থেকে গেল বাজারের সঙ্গে সহাবস্থান করে, যে ঘটনা কপিরাইট থাকতে উপযুক্ত শিল্পী নির্বাচনের অদৃশ্য, অথচ প্রবল মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাই এই প্রসঙ্গেও দেখা গেল যাবতীয় নিয়ম বা অর্ডার এবং মিউজিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাবতীয় ডিসর্ডার বা বিশৃঙ্খলা কপিরাইট থাকাকালীন একইসঙ্গে ঘটেছে, ঠিক যেমন, সামাজিক ক্ষমতার বিধান অনুযায়ী সমাজে কিছু 'ভালো' লোক খোলা থাকে আর কিছু 'বেয়াড়া' লোক বন্ধ থাকে। কিছু মানুষ লকডাউনে ঘরে থাকতে পায়, আর কিছু

'বেয়াড়া' মানুষ হাজার মাইল পাড়ি দেয় বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু এলেও। সব একইসাথে ঘটে। এখানেও কিছু 'বেয়াড়া' মানুষ দেখতে পেলাম আমরা।

অথচ, 'ভালো' আর 'বেয়াড়া' মানুষের এমন সমীকরণের হিসেব শুধু নস্যাৎ করাই নয় – তাকে উলটে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রক্তকরবীতে রঞ্জনকে যে ভাষায় লিখছেন তা কি শুধু রঞ্জনে সীমাবদ্ধ?

"মানুষটার ভয়ডর বলে কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি...ভাবলুম মানুষটা চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হলো, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের নাচিয়ে তুললে, বললে, আজ আমাদের খোদাইনৃত্য হবে...রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, মাদল পাই কোথায়, ও বললে, মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কি লোফালুফি...রঞ্জন বললে, কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে..."।

কিংবা, অচলায়তনে পঞ্চকের আর্তি কি শুধু পঞ্চকের?

"ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছি নে - তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায় - তুমি জোর দাও - তুমি জোর দাও - তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না..."।

Society Language and Culture

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর থেকে যেন পূর্বনির্ধারিত এক কুলীন প্রথা আবার সব প্রতিবাদী সাইনা বা সংকেতগুলিকে যেন ঢেকে দেওয়ার প্রয়াস করল। তাই নিঃসন্দেহে এখানে একটা পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাস কাজ করছিল –

(ক) যে নিয়ম শুধু প্রতিষ্ঠানই মানে;

(খ) আর বেনিয়ম শুধু 'বেয়াড়া' ব্যক্তি করে; এমনটাই মানা হয়ে থাকে।

এর কারণটা খুবই সঙ্গত। প্রতিষ্ঠান বেয়াড়াপনা করে, একথা যতক্ষণ না নিজের ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ সাধারণ মন মানতে চায় না। আর বেয়াড়াপনা যে ব্যক্তিই শুধু করে সেকথা মানার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে দায়ি করতে পারার মতো সহজ ঘটনা সাধারণ মন সহজেই ঘটাতে পারে। আর এই যাবতীয় বিচার ভীষণভাবে সময়-পরিসর কেন্দ্রিক, কাজেই স্থান-কাল সুবিধামতো বিচার করে কাউকে দায়ি করে ফেলতে পারলেই হল। অথচ প্রতিষ্ঠানটা যে সর্বক্ষণ প্রভাব খাটিয়েই চলেছে তার দিকে চোখ পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনায় প্রতিষ্ঠানের এই বাড়াবাড়ি চোখে পড়লেও তাঁর নিজের ছায়ার নেপথ্যেই মহাপ্রয়াণের পর থেকে সেই প্রভাব খাটানোর প্রক্রিয়া চলেছে এক অভূতপূর্ব কৌলিন্যের আড়ালে।

এই প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবে বেশ কিছু মানুষের মধ্যে 'তিন' ভয়ংকর বেয়াড়া মানুষকে আমরা দেখতে পেলাম পঞ্চাশের দশক থেকেই – এক, দেবব্রত বিশ্বাস; দুই, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; আর তিন, কিশোর কুমার। তিনজনই বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের রোষানলে পড়লেন এবং ব্রাত্য হলেন। বাকিরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নিতান্তই রবাহুত,

অপাংক্তেয়। ভাবতে পারেন, এমন মহীরুহ বেয়াড়ার আড়ালে আরও কত বেয়াড়া অথবা অসহায় অথচ মেধাবী হারিয়ে গেছে চিরতরে!

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই যে নিয়মের ব্যতিক্রম, তা সব যুগেই হলেও, তাদের সঙ্গে সঙ্গে একই পংক্তিতে ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যদি সময় না থাকে, তাহলে প্রশ্নের মধ্যে আসবে আশা করি।

এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা ঠিক কী ছিল? এক, গায়কী; দুই, যন্ত্রাণুষঙ্গ; তিন, পরিবেশনা। তিনজনের গানই নানা বিতর্কের মধ্যে দিয়ে কখনো অনুমোদন পায়নি, কখনো মিউজিক কোম্পানির অনুরোধে কোনোক্রমে পাশ করানো, আর কখনো সিনেমা নির্মাতার বিশেষ অনুরোধে অনুমোদন। সরকারী আকাশবাণী-তেও ব্রাত্য হয়ে থাকতে হয়েছে।

এবার যে প্রশ্নটি আমি করব, তা হল, শিল্পের তথা গানের প্রকাশ এবং পরিবেশনার যে অর্ডার বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড সৃষ্টি করলেন তাতে দেবব্রত বিশ্বাস থেকে শুরু করে অনেকেই ব্রাত্য হলেন। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রমের কি এই একটাই চেহারা? ঠিক এইখানটিতেই রয়েছে যথেচ্ছ বিতর্ক।

এই প্রসঙ্গে এ যাবৎকালে না হওয়া সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা অবয়ববাদী বিশ্লেষণ করব।

অবয়ববাদী বিশ্লেষণঃ

অবয়ববাদী বিশ্লেষণের শুরুতেই উপরে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে তার নেপথ্যে মুখ্য দ্বন্দ্বটি ছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত সময় থেকে একদিকে মুখ্যত গণনাট্য আন্দোলন নির্ভর রবীন্দ্রচর্চা যার মধ্যে রবীন্দ্রগান এবং রবীন্দ্র নাটক শিক্ষণ ও পরিবেশনা, আর অন্যদিকে বিশ্বভারতী এবং তার মিউজিক বোর্ডের আশ্রমিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এই মুখ্য দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হল নানা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন।

Society Language and Culture

এবার দেখা যাক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবয়ব কেমন ছিল? কবে প্রতিষ্ঠা হল?

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকা পর্যন্ত যাবতীয় নিয়ম বিশ্বভারতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাইরের পৃথিবীর মানুষকে কিছু করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মিউজিক বোর্ডের অনুমোদন নিতে হত।

উল্লম্ব প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার

রবীন্দ্রপ্রয়াণের অব্যবহিত সময় থেকেই মুখ্যত আশ্রমিকদের প্রেরণায় কলকাতায় একেবারে ব্রাহ্মসংস্কৃতির আবহে শুরু হল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ, নিয়মমাফিক গান গাওয়ার, প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনটা অনুভূত হল। অনেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি খোলার মতো বিষয়টা। সেটা শুরু হল একেবারে ১৯৪১-এর গোড়াতেই।

এমন প্রসারিত আবহে যদি প্রাতিষ্ঠানিকতার শ্রেণি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে, মুখ্যত মিউজিক বোর্ডের সদস্যদের অনুপ্রেরণা এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসম্পদ কপিরাইটের নিয়ম মেনে শিক্ষার প্রসার ঘটল। বিষয়টা

একেবারেই 'বাইনারি' চরিত্রের ছিল। এবার হল একদিকে বিশ্বভারতী এবং এই দু'টি-তিনটি প্রতিষ্ঠান এবং বাকি পৃথিবী যারা কেউ কেউ নিয়ম অতটা জানে না, আর বাকিরা নিয়ম মানেও না।

কারা শিখতে এলেন? এলেন তো অনেকেই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আবহের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসেবে শান্তিনিকেতন এবং কলকাতা – দুই জায়গাতেই শিখতে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিলেন বেশ কিছু শিক্ষিত-এলিট পরিবার, যাঁরা অচিরেই উত্তরাধিকারসূত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার মুখ্য দায়িত্বে চলে এলেন। এই দুই প্রজন্ম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে একেবারে নব্বই দশক পর্যন্ত সবটাই কৌলিন্য বলে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন। এখানে কপিরাইট ব্যবস্থাটি ছিল একটি বৃহৎ জালের আড়াল, যেখান থেকে মিউজিক বোর্ডের সদস্যরাই সামগ্রিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

বুঝতেই পারছেন, যে সময়ে এমন এক শ্রেণি-নিয়মের কথা বলছি, সে সময়েই তথাকথিত 'বেয়াড়া' মানুষগুলি আমাদের মন জয় করে ফেলেছেন। এঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আবার কিছু অগ্রগণ্য শিল্পীদের প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল – এঁদের মধ্যে সাগর সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্রের নাম তো করতেই হয়। এককথায় জনগণ আদর করে এঁদের কাছে টেনে নিল।

তবে বৈপ্লবিক কাজকর্মও তখন কিছু কম হয়নি, যেটা নিয়ম পছন্দ করেনি। 'কৃষ্ণকলি' কবিতা/গানের পটপরিবর্তনে যে গান বাঁধলেন সলিল চৌধুরী – সেই মেয়ে – তা গাইলেন সুচিত্রা মিত্র। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে রবীন্দ্রগানের সুর-গায়কীর শুদ্ধতা নিয়ে তাঁর আবেগ কিছুমাত্র কম ছিল না। বহু জায়গায় তিনি প্রতিবাদও করেছেন যে কোনো ধরনের বিকৃতির। আবার সত্তরের দশকে শচীন দেববর্মন ফিল্ম কায়দায় ব্যবহার করলেন, 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি' গানের আদল। অতএব, প্রশ্নটা ভালো-খারাপের দ্বন্দ্ব নয়, কারণ তাতে একশো শতাংশ মানুষই বলবেন 'ভালো'। আসলে প্রশ্নটা ছিল 'কৌলিন্যের সঙ্গে অপর'-এর। এই 'অপর' আসলে কৌলিন্যের কাছে চিরকালই other বা প্রান্তিক হয়েই ছিল বা আজও আছে।

Society Language and Culture

যে সামাজিক প্রভাবের কথা বললাম - মিউজিক বোর্ডের কী কী কপিরাইটগত বৃহত্তর ক্ষমতা ছিল? কেন্দ্রীয় সংস্থা আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সঙ্গীত বিভাগের মূল নিয়ন্ত্রণ, এবং কোন শিল্পীর গান রেকর্ড হবে তার অনুমোদনকারীর বিপুল ক্ষমতা। স্বাভাবিকভাবেই, বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেড়ে গেল বহুগুণ। বাকিরা পেছনের সারিতে। মিউজিক বোর্ডের সদস্যরা কৌলিন্যে এবং বাজারে প্রবল ব্রাহ্মণত্বে বেড়ে উঠলেন।

এইভাবে মিউজিক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের হাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার ঘটল এবং কালের নিয়মেই প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানে এল তৃতীয় প্রজন্ম - আজ যাঁরা মধ্যবয়সী। তাঁরা নব্বই দশকের শেষ থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন বাজারী বা পেশাদারী মঞ্চে। ততদিনে কপিরাইট উঠল। অর্থাৎ, ২০০১।

পক্ষান্তরে, রাজ্য সরকার আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে অডিশনের মাধ্যমে বহু শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও গান পরিবেশনের সুযোগ পেলেন। এই বিষয়টি খুব স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, এমনটা মোটেই বলা যায় না। এঁরা প্রধানত "কোথা থেকে শিখেছে জানি না বাবা" (বলে মুচকি হাসি) হিসেবেই

পরিচিত হলেন এবং এমনকি সরকারী মঞ্চেও এইসব শিল্পীদের যথেষ্ট বক্রদৃষ্টি সহ্য করতে হল। 'অডিশন'-এ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও "কী করে সুযোগ পায় কে জানে" – এমন মন্তব্য প্রায়শই শুনতে হত।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রগান পরিবেশনের ক্ষেত্রে কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নতুন দ্বন্দ্ব আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই দৃশ্যমান হচ্ছিল। অবশ্য এরই মধ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বেশকিছু শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে দ্বন্দ্বটির তেমন সুরাহা হয়নি, যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল।

যাই হোক, কপিরাইট থাকাকালীন একদিকে গায়কী সমস্যা, পরিবেশনার ক্ষেত্রে কৌলিন্যের সমস্যা থাকলেও সেখানে এমনকি কণ্ঠী শিল্পীও সেই কৌলিন্যে দিব্যি পাশ করে গেলেন। এটাই আশ্চর্যের। ফলে যা ঘটল সেটা বিভিন্ন শিল্পীর পক্ষে যথেষ্ট সমস্যার হয়েছিল।

কিন্তু এ কি শুধু এই সময়েরই চিত্র? সম্ভবত না।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ না করলেই নয়। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখছেন, "সেই ইনিসফ্রি দ্বীপটা কোথায় বলতে পারো?..." অর্থাৎ বজ্রআঁটুনির জোরে স্রষ্টার কী অবস্থা হয়েছিল...যাইহোক তিনি নিজে যে দর্শনে বিশ্বাস করতেন এবং লিখে গেছেন বারবার, সেটা জানলেই বোধহয় সবাই সবার নিজের জীবনে আসলে কী অভিজ্ঞতা সেটা যাচাই করে নিতে পারবেন।

Society Language and Culture

১৯২৫-এই লেখা এমন বিশ্লেষণের দুটো অর্থ হতে পারে –

বৃহৎ প্রেক্ষাপট - ক্ষমতাশালী মানুষ নিজেরাই একজোট হয়ে দৈত্যাকৃতি সিস্টেম বানিয়েছে, যা নিজেই নিজেকে আর মানছে না।

সংকীর্ণ প্রেক্ষাপট – কিছু হরিদাস একজোট হয়ে সিস্টেম বানিয়েছে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই তাদের নেই। জালের আড়াল (পড়ুন/শুনুন প্রতিষ্ঠানের) থেকে চেঁচিয়ে চলেছে – 'গেল গেল' বলে। প্রতিষ্ঠান বিরাট হলেও যে সিস্টেমকে সাধারণের কাছে নিয়েই যাওয়া হল না – অর্থাৎ, সাধারণ কৌলিন্য থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে গেল।

রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট জমানায়, অর্থাৎ যা ২০০১ পর্যন্ত গত ৬০ বছরে দেখলাম এবং কপিরাইট মুক্তির পরে গত দু'দশকে যা দেখলাম, সেখানে 'নিয়ন্ত্রণ'টাই মুখ্য বিষয়। কখনো আকাশবাণী-দূরদর্শন নিয়ন্ত্রণ, এবং পরে রাজ্য সরকারী অনুষ্ঠানাদিও নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের কাছাকাছি আসা আবার সরকারী কর্তাদেরও বেশ কৌলিন্যপ্রিয় হয়ে ওঠা - এই দুই ক্ষেত্রের ঘটনাবলীতেই সত্তর বছর পার।

কপিরাইট-উত্তর পর্বঃ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বনাম সমালোচনা বনাম নৈরাজ্য অর্থাৎ তিন শক্তির লড়াই

কপিরাইট উত্তরপর্বে কৌলিন্য, নিয়ন্ত্রণ, শুদ্ধতা, রবীন্দ্রভাবনা, শুদ্ধতার মাপকাঠি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংকেতের জীবনধারণ নিয়ে নতুন পর্ব উপস্থিত হল। প্রথম ধাক্কা এল এই নিয়মের প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধেই।

একেবারে ১৯৯১ সাল সময় থেকেই পালটা ক্ষণস্থায়ী জীবনমুখী গানের ধারা নিয়ে এল এক ধাক্কা। স্বভাবতই এর কাণ্ডারী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গানের অভিমুখ কৌলিন্যকে ধাক্কার দিল।

লাইনটা ছিল এইরকমঃ বছরে তিরিশবার চিত্রাঙ্গদা আর শ্যামা শাপমোচনের অশ্রুমোচন – সব আমাদের জন্য; গজলের ছয়লাপ আধুনিক কিংখাব কিং-সাইজ ভজনের শিবের গাজন – সব আমাদের জন্য। অর্থাৎ, একটা কিছু পরিবর্তনের। কী সেটা? এককথায় বলা যাবে না।

কিন্তু এই ধাক্কা ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং কৌলিন্য না হলেও প্রাতিষ্ঠানিকতার লোভ থেকে খুব দূরে ছিল না। তার প্রমাণ কয়েক বছরের মধ্যেই পাওয়া গেল। তবে সাধারণ মানুষ এতসব খুঁটিনাটির কিছুই টের পেল না। কিন্তু আজ এর উৎসসন্ধান করতেই হবে।

উৎসসন্ধানে

এই পরিবর্তনের সংস্কৃতিগত উৎস কোথায়? সে কি শুধুই বিপথগামী? যাকে আমরা 'অ্যাবারেন্ট ডিকোডিং' বলব?

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে শুদ্ধতার প্রশ্নে যে আশঙ্কা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল সেই আশঙ্কার উৎস কপিরাইট ওঠার পরের পশ্চিমী বা বলিউডি উদ্দামতা নয়। এ উৎস অনেক পুরনো, অন্তত রবীন্দ্রসঙ্গীতে এর প্রভাবের প্রশ্নে। সত্তরের দশকে যে বিকল্প মুক্তিকামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার একটা বড় মাধ্যম ছিল গান – মুক্তির গান। তার উচ্ছলতা (উদ্দামতা নয়), যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার, গায়কের গায়কীর যে উচ্ছল পরিবর্তনের প্রকাশ, সেইগুলোই ছিল মুখ্য।

Society Language and Culture

তিন দশক পরঃ সেই এলিট বনাম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

এই আন্দোলনের তিন দশক পর ভারতে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করল রবীন্দ্রগানের পরিবেশনেও। অর্থাৎ গিটারের অতি ব্যবহার, যেমন দেবব্রত বিশ্বাস বা চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মতো এবং মঞ্চে অনুষঙ্গ হিসাবে নয়, প্রধান যন্ত্র হিসেবেই তার ব্যবহার এবং তৎসংশ্লিষ্ট মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন পুরনো দর্শকের কাছে বিরাট ধাক্কা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই – মুখ্যত সেই দৃশ্যপটের আধিক্যে মধ্যবিত্ত সমাজে 'গেল গেল' রব উঠল। অথচ, যে এলিট সমাজের এ জাতীয় বিদেশী ঢেউয়ের অভিজ্ঞতা ছিল তারা কিন্তু তেমন আশ্চর্য হলেন না। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে ভুরি ভুরি।

আন্দোলন থেকে বাজারী পরিবেশনা

কলকাতাস্থিত রবীন্দ্রসংগীতের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাঁরা দ্বিতীয় প্রজন্মের (আশ্রমিক পরবর্তী) পরিবারগত উচ্চবিত্ত-এলিট শিক্ষক-পরিবারগুলি সদস্য তাঁদের পরের প্রজন্মের 'বিদেশে ঘোরা' আত্মীয়-স্বজনদের (অর্থাৎ যাঁরা কপিরাইট মুক্তির পরের মানুষ) তাঁদের দ্বারা মঞ্চের এমন নতুন কাণ্ডকারখানার অভিজ্ঞতা দিব্যি সয়ে গেল। এরাই একদিকে শান্তিনিকেতনের সুতো অন্যদিকে কলকাতার প্রথম-দ্বিতীয় প্রজন্মের সুতো দুইয়ের মুখটাই হাতে পেয়ে গেল। আন্দোলন বাজারী কেরিয়ারের প্রয়োজনে কুলীনদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতিয়ার হয়ে উঠল।

মাঝখান থেকে যেসব সাধারণ মধ্যবিত্ত, আশ্রমিক বা দ্বিতীয় প্রজন্মের দ্বারা 'শিক্ষাপ্রাপ্ত' অথচ পারিবারিক ব্যাপ্তি তেমন নেই তাঁরা শুদ্ধতা, অর্থাৎ তার যেটুকু কৌলিন্য দেখেছিলেন এবং তাকে আত্মস্থ করেছিলেন, সেইটুকুর রক্ষায় বেশি আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন। 'পরশপাথর' ছবির দৃশ্যের কথা মনে পড়ে? যখন লোহা সোনায় পরিবর্তন হবার আশঙ্কায় মধ্যবিত্ত-গরীব তার যেটুকু সঞ্চয় ছিল সেটুকু কীভাবে রক্ষা হবে তার আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। এখানকার অবস্থাও অনেকটা তাই। এখানে রবীন্দ্রনাথ মুখ্য নন, আমাদের সঞ্চয় রক্ষা করাটাই মুখ্য।

মনে রাখতে হবে, এটা খুব অমূলক নয়। কারণ, এইভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত কয়েক দশক ধরে তাদের জীবন সাজিয়ে নিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই ধারা সৃষ্টি করেছিল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত শিল্পীদের গান। অর্থাৎ, কপিরাইটের সুযোগ।

এটাও পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, যখন দেবব্রত বিশ্বাস, কিশোর কুমার, এমনকি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়রা ব্রাত্য হলেন, তবু তাঁদের ঠাঁই দিতে এগিয়ে এলেন তাঁদেরই সহযোদ্ধারা – কারা বলুন তো? সিনেমা স্টলওয়ার্টরা – সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল, তপন সিনহারা – এর পরবর্তী সময়ে তরুণ মজুমদারের মতো শক্তিশালী নির্মাতারা। অর্থাৎ, একটা বিকল্প আন্দোলন তৈরি হল, যেখানে জনপ্রিয়তা বা কাউন্টার-এলিট উপাদানটা ফ্যাক্টর হয়ে গেল। 'মিউজিক বোর্ড'-এর কিছু করার থাকল না।

আবার, যদি নিন্দুকের মত বলেন, তাহলে সত্যজিতের 'চারুলতা'-এ কিশোর কুমারের কণ্ঠে "আমি চিনি গো চিনি তোমারে" গানের শেষে যে ইম্প্রোভাইজ করা বা বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল, তা কীভাবে পাশ হল সেটা আশ্চর্যের তো বটেই।

Society Language and Culture

তাই ব্রাত্য-অব্রাত্য সবার ক্ষেত্রেই 'গায়কী-বিতর্ক'ও মূল্যহীন হয়ে গেল। ঋত্বিকের ভাষাতেই বলি, 'তোরা কীরকম সব মিলেমিশে এক হয়ে গেলি'। আর আমরা সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গেলাম পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো একেবারেই বিচ্ছিন্ন, বৃহৎ শক্তির আনুকূল্য-নির্ভর হয়ে।

উপসংহার

তাহলে আজ কী দাঁড়াল? কৌলিন্য এবং নতুন মুক্ত-যন্ত্রানুসঙ্গ – সেই এলিট গোষ্ঠীর ভূষণ হয়েই থেকে গেল। তাদের কেন্দ্র করে ব্যান্ড-সংস্কৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বাজার সৃষ্টি হল। মাঝখান থেকে আমরা বিপুল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ আবার এই নতুন বাজারের গ্রাহক হব কি হব না সেই বিতর্কে ঢুকে পড়লাম। এটা ভালো না ওটা ভালো? আবার যাঁরা আজ সদ্য আঠারো-যুগের মানুষ তাঁরা আমাদের প্রতি হয় বিদ্রোহী না হয় বিচ্ছিন্ন – এমনটাই আমাদের মনে হচ্ছে। অর্থাৎ, নিজেরাই নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে 'গ্রাহক' হবার প্রতিযোগিতা করছি।

এর ফল প্রতিষ্ঠানকে ধাক্কাও দেয় না, আবার সাধারণ জনগণকে আরও নিম্নবর্গীয় করে তোলে। তারা শিক্ষিত সমাজ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার ফল আমরা প্রতিমুহূর্তে দেখছি।

ফলত, মুখ্যত বিপদগ্রস্ত আমরা গত দু'দশকের যুবক-মধ্যবয়সীরা দারুণ ঝামেলায় আছি। আমাদের মধ্যে শিক্ষার প্রাবল্য যথেষ্ট বেশি। অর্থাৎ, সাধারণের থেকে যথেষ্ট দূরে, তারা আপন পালন করা কৌলিন্য নিয়ে আছি। অবশ্য

কৌলিন্য বলতে মুখ্যত যাঁদের নিয়ে আছি তাঁরা ব্রাত্যই ছিলেন। তার মানে আমাদের কাছে তথাকথিত মিউজিক বোর্ডের ব্রাত্য ও অব্রাত্য সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমাদের মূল বিরোধ এখন তিন ধরণের সাথেঃ

(১) যারা নবারুণের ভাষায় 'ঝিনচ্যাক' নির্ভর রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়;

(২) যারা কথা উল্টোপাল্টা করে নেয়; এটা চট করে মঞ্চে দেখা যায় না, সিনেমাতেই এর প্রাবল্য বেশি। অবশ্য এক্ষেত্রেও সবার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে এমনটা বলা যাবে না – কারণ সব চলচ্চিত্র নির্মাতার সামাজিক প্রভাব একরকম নয়;

(৩) যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার নামে একেবারে খিস্তি করছেন; কাদের করছেন; মুখ্যত আমাদের, যাঁদের বটবৃক্ষ বটব্যাল বলা হয়েছে।

এই তিন প্রকারের ঝঞ্ঝাটে আপাতত আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন প্রশ্ন হল, এর থেকে কি পরিত্রাণ আছে অথবা কী পরিত্রাণ আছে? উত্তর হল, আমরা বড়জোর বিশ্লেষণ করতে পারি। যা দেবব্রত বিশ্বাস সহ্য করেছেন, সেখানে আমরা কে?

(Dr. Abir Chattopadhyay is an Author, Academician, Cultural Activist & Editor - Society Language and Culture)

Society Language and Culture